পথের টানে

‘সাগরজলে সিনান করি’

ঋতা বন্দ্যোপাধ্যায়

সেটা ছিল ১৯২৭ সালের অক্টোবর মাস। দ্বীপপুঞ্জের দেশ ইন্দোনেশিয়ার বালি, জাভা প্রভৃতি দ্বীপগুলি সফরকালে রবীন্দ্রনাথ ‘সাগরিকা’ নামের দীর্ঘ কবিতাটি জাহাজে বসেই লিখেছিলেন। বালিদ্বীপ যেন সত্যিই সাগরস্নাত। সেবার তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে।

প্রাচীনকালে ভারত (এক্ষেত্রে দক্ষিণ ভারত) বিশেষ প্রভাবশালী দেশ ছিল। সুদূর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতি-দর্শন-ধর্ম সবই ব্যাপক বিস্তারলাভ করেছিল। যোগসূত্রের মাধ্যম ছিল মশলা-দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য। অধুনা থাইল্যান্ড (শ্যামদেশ), কম্বোডিয়া (কাম্বোজ বা কাম্পুচিয়া), ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে এলে মনে হয় যেন প্রাচীন ভারতের একটি খণ্ড আজও এখানে জীবন্ত।

ভারতের মতো ইন্দোনেশিয়াও বহুভাষাভাষী বিবিধ জনগোষ্ঠীর দেশ। সুমাত্রা, জাভা, বালি, টিমর—ভিন্ন ভাষার দ্বীপ। নৃতত্ত্বের দিক দিয়েও খুব মিশ্র জাতি। ইন্দোনেশিয়ান ‘বাহাসা’ হল রাষ্ট্রভাষা। কারও কারও মতে ‘বাহাসা’ শব্দটি সংস্কৃত ‘ভাষা’ শব্দ থেকে উদ্ভূত। এখানে অবিকৃত ও বিকৃতভাবে সংস্কৃত ভাষাকে প্রভূত পরিমাণে খুঁজে পাওয়া যায়। বালিদ্বীপের প্রায় আশি শতাংশ মানুষ হিন্দু ধর্মাবলম্বী। অন্যান্য দ্বীপে কিছু সংখ্যক বৌদ্ধ, খ্রিস্টান থাকলেও প্রধানত ইসলাম ধর্মাবলম্বীই সংখ্যাগরিষ্ঠ। ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে এরা স্বাধীনতা পায় আমাদের চেয়ে সামান্য আগে—১৯৪৫ সালের ১৭ আগস্ট। রাজধানী জাকার্তা জাভাদ্বীপে অবস্থিত।

ভারত থেকে সরাসরি উড়ান না থাকাতে, হয় ব্যাংকক, নয়তো মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর নতুবা সিঙ্গাপুর হয়ে যেতে হয়। বালির আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ন্‌গুরাহ্‌ রাই (Ngurah Rai) বালির রাজধানী ডেনপাসার-এ অবস্থিত। আমাদের গন্তব্য বালির দ্বিতীয় প্রধান শহর উবুদ (Ubud)।

বিমানবন্দরের বাইরে ঘটোৎকচের মূর্তি দেখে প্রমাণ পেলাম বালিদ্বীপে আজও ভারতীয় সংস্কৃতি জীবন্ত। ঘটোৎকচ ভারতে প্রায়বিস্মৃত হলেও এখানে বীরযোদ্ধারূপে মান্যতা পান। রামায়ণ-মহাভারত এঁদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ-দেশের অধিবাসীদের সহজাত শিল্পবোধ খুব উন্নত। এঁরা রোজ সুচারুভাবে গাঁদা, কাঠগোলাপ, নয়নতারা, কলকে, জবা ইত্যাদি ফুল

দিয়ে ঘর সাজান। এঁদের ছন্দোময় নৃত্যশৈলী দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। জাভাদ্বীপের বিশেষ শিল্পশৈলী ও ছায়ানৃত্যশৈলী তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যেই মনোমুগ্ধকর। 'রামলীলা' ছায়ানৃত্যের ভাবনা উদয়শংকর হয়তো জাভার ছায়ানৃত্য থেকেই পেয়েছিলেন। কাপড়ের উপর বাটিক পদ্ধতির নকশা জাভা থেকেই সংগ্রহ করে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে প্রচলন করান। আজকের 'ইক্কৎ' বুননও জাভা থেকে দক্ষিণ ও পরে পশ্চিম ভারতে পৌঁছেছিল প্রাচীনকালেই।

বালিদ্বীপে মন্দিরের নামের আগে 'পুরা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এটি সংস্কৃত 'পুর' শব্দ থেকে এসেছে।

উবুদের রিসর্টে পৌঁছে পথের ক্লান্তি দূর করলাম আমাদের মতো 'আদা-চা' দিয়ে। এঁরা বাড়িতে সচরাচর নারকেল তেল দিয়ে রান্না করেন, খাবারে নারকেলের দুধ দেওয়ারও চল আছে। প্রায় আমাদেরই মতন সব মশলাপাতি ব্যবহার করেন, বরং আরও কিছু বেশি। খাবারের উপর সুন্দর করে তুলসীপাতা সাজিয়ে পরিবেশন করেন। বালিনিজ সংস্কৃতির সঙ্গে প্রথম পরিচয় হল সন্ধ্যায়—এখানকার বিখ্যাত 'কেচক' নাচ দেখতে গিয়ে। খোলা আকাশের নিচে, দীপ জ্বালিয়ে, মঞ্চহীন এই নাচ চমৎকার। মেয়েরা শ্রীময়ী, লাবণ্যময়ী, ছন্দোময়ী। কাহিনি রামায়ণের। নৃত্যনাট্যটি মোটামুটি বোঝা গেল।

সরস্বতীমূর্তি, উবুদ প্রাসাদ

উবুদকে কেন্দ্র করে অনেক কিছু দেখার আছে। কিন্ডামনি জেলায় অবস্থিত সক্রিয় আগ্নেয়গিরি মাউন্ট বাটুর পর্যটকদের অবশ্যদ্রষ্টব্যের মধ্যে পড়ে। এ-পাহাড়ে ট্রেকিং-এরও সুযোগ আছে। পাহাড়ের তলদেশে আগ্নেয়গিরি থেকেই সৃষ্ট হয়েছে সবুজ স্বচ্ছ জলের একটি হ্রদ। কেবল বালিদ্বীপেই একাধিক সক্রিয় আগ্নেয়গিরি আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আগুঙ্গ। দৃশ্য অপূর্ব।

বালির বিখ্যাত পুণ্যসলিলতীর্থ---পুরা তীরতা এমপুল (Pura Tirta Empul) যাওয়ার পথে পড়ল ধাপে ধাপে তৈরি করা বিশাল ধানখেত। ধানের খেতে হাঁটা পর্যটকদের ভারি প্রিয়। এই সলিলতীর্থটি দশম শতকে বর্মদেব রাজবংশ দ্বারা নির্মিত। স্বাভাবিক জলধারা বাঁধানো মুখ দিয়ে পুকুরে পড়ছে। এই জল স্থানীয় মানুষজন অমৃতধারা বলে গণ্য করেন। গঙ্গাস্নানের পুণ্য হয় এখানে স্নান করলে—এমনই এঁদের বিশ্বাস। ভারতের গঙ্গা এঁদের কাছেও মহাপবিত্র। পাশে আর একটি পুকুরে রংবেরঙের মাছ নির্ভয়ে খেলে বেড়াচ্ছে দেখলাম।

সলিলতীর্থ দেখে আমরা এগোলাম গোয়া গজ (Goa Gajah) মন্দিরপানে। এখানে সব মন্দিরেই শালীন পোশাক পরার কথা হলেও বাস্তবে প্রায়ই তা ঘটে না। ওঁদের মতে মানুষের নিম্নাঙ্গ হল দেহের মধ্যে নিকৃষ্টতম। তাই নিম্নাঙ্গ আবৃত করার

মন্দিরদ্বার, গোয়া গজ

জন্য লুঙ্গির মতো ‘সারং’ জড়িয়ে নেওয়া পুরুষ-মহিলা সবার পক্ষে বাধ্যতামূলক। অল্প মূল্যের বিনিময়ে মন্দিরদ্বারের সামনেই ভাড়া পাওয়া যায়। গোয়া গজ গুহার প্রবেশমুখে মুখব্যাদান করা এক ভীষণ দানবমূর্তি। টিকিটের দাম সর্বত্রই বেশ চড়া। অবশ্য ইন্দোনেশীয় রুপিয়ার দাম ভারতীয় টাকার চেয়ে অনেকটা কম। গুহার পাশ দিয়ে, ধাপে ধাপে পাহাড় থেকে পথ নিচে সমতলে নেমে গেছে। সেখানে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব ত্রিমূর্তি বিরাজমান। ইন্দোনেশিয়ার বহু হিন্দু মন্দিরেই এই ত্রিমূর্তি পূজা পাচ্ছেন দেখা যায়। আছেন বুদ্ধদেবও। সব হিন্দু মন্দিরের মতো এখানেও আছে একটি বাঁধানো পুকুর। আছে পাথরের গজমূর্তিও।

সন্ধেবেলা উবুদ বাজারে ঘোরা পর্যটকদের কাছে আর একটি বড় আকর্ষণ। তবে এখানে অঢেল দরাদরি অবশ্যকর্তব্য। বালির বিখ্যাত মাতৃমন্দির পুরা বেশাখি না দেখলে বালি ঘোরা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এটি সক্রিয় আগ্নেয়গিরি আগুঙ্গ-এর দক্ষিণ-পশ্চিম ঢালে। ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে ও ২০১৮ সালের জুন মাসে যথেষ্ট ধোঁয়া উদ্‌গীরণ করেছিল এই আগ্নেয়গিরি। ২০১৯-এর মে মাসেও আগুঙ্গ সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। বিরাট চত্বর জুড়ে বিভিন্ন দেবদেবীর মন্দিরের মাঝে মূল মন্দিরটি ইন্দোনেশিয়ার বিশিষ্ট শৈলীতে গঠিত। দেখা গেল মূল মন্দির বন্ধ। কেবল বিশেষ বিশেষ পূজার দিনে খোলে। মন্দিরের কারুকার্য সূক্ষ্ম। পশ্চাৎপটে আগুঙ্গ-এর সৌন্দর্যও নয়নাভিরাম।

আমাদের আজকের ভ্রমণসূচিতে আছে বানরারণ্য বা Monkey Forest। এখানে ইন্দোনেশিয়ার এক বিশেষ প্রজাতির বাঁদরদের বাস। দেখলে মনে হয় তাদের পাকা গোঁফ, পাকা ভুরু! কেবল পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য ও পশুদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসাবেই এই অরণ্য গড়ে তোলা হয়নি, এর কেন্দ্রবিন্দুতে আছে হিন্দু দেবদেবীর মন্দির—শিব,

পুরা বেশাখি, মাতৃমন্দির

গঙ্গাদেবী ও প্রজাপতি ব্রহ্মার। ধর্ম-দর্শন-ব্যাবহারিক সমাজ একত্র হয়ে 'ত্রিহিত করণ' ভাবনা থেকে এর উৎপত্তি। সম্ভবত হনুমানের প্রতিভূ হিসাবেই বাঁদর মান্যতা পায়।

উবুদ থেকে লম্বকের (Lombok) বেশ খানিকটা দূরত্ব। সেখানে বাটু বোলং (Batu Bolong) মন্দির অবশ্যদ্রষ্টব্য। ভারত মহাসাগরের উপর প্রাকৃতিক ব্রিজের মতো বেরিয়ে থাকা এক বিরাট পাথরের উপরে এই মন্দির দেখে চোখ ফেরানো যায় না। নিচে সৈকতও খুব সুন্দর। নামার সিঁড়িও আছে। আরও নিচে উত্তাল ফেনিল জলরাশি।

ভারত মহাসাগরের বুকে আরও একটি মন্দির আছে বালিদ্বীপে—পুরা টানা-লট (Pura Tanah-Lot)। মন্দির এবং মহাসাগর—দুই-ই অপরূপ। সমুদ্রের ভিতর মন্দির দেখা শেষ হলে আমরা আর এক হিন্দু মন্দির দেখতে গেলাম পাহাড়ের উপর—পুরা উলু ওয়াটু (Pura Ulu Watu)। পাহাড়ের উপর থেকে বহু নিচে অস্থির, উত্তাল নীল ভারত মহাসাগর ও সৈকত দেখতে বড়ই সুন্দর লাগে। পাহাড় থেকে নেমে আমরা জিম্বারন (Jimbaran) সৈকতের উদ্দেশে রওনা হলাম। সমুদ্রে সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে সদ্য-ধরা মাছ ঝলসে খাওয়ার ব্যবস্থা। আমরা সেখানে পৌঁছতে পৌঁছতে সূর্য পাটে গেছেন। যাওয়ার আগে চড়া রঙে রাঙিয়ে দিয়ে গেছেন সারা আকাশটাকে। চমৎকার সৈকত জুড়ে টেবিল-চেয়ার লাগানো। টাটকা সামুদ্রিক মাছ ও অন্যান্য প্রাণী পছন্দ করে বলে দিলে তখনই ঝলসে গরম গরম পরিবেশন করা হচ্ছে। সামনে অসীম সমুদ্র—লালচে থেকে ক্রমে কালচে হয়ে আসছে আর সামনে প্লেটে শোভা পাচ্ছে বিরাট রেড স্ন্যাপার! বালিদ্বীপের বিভিন্ন জায়গায় বহু ভাল সৈকত আছে, যেগুলোয় পর্যটকদের যাওয়ার বিরাম নেই।

বালির অন্তর্দেশীয় বিমান পরিষেবার নাম 'গরুড়'—ভারতীয় প্রভাবের আর এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তা, জাভাদ্বীপে অবস্থিত। কেবল রাজধানীর জন্যই গুরুত্ব যে তা নয়, এই দ্বীপেই অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম বৌদ্ধ স্থাপত্য বোরোবুদুর, যা UNESCO দ্বারা 'বিশ্বঐতিহ্য' তালিকাভুক্ত। এই অনন্যসাধারণ মন্দিরটি মহাযানী বৌদ্ধদের দ্বারা নির্মিত। জাভায় যখন শৈলেন্দ্র বংশের রাজত্বকাল, সেই সময়টাকে স্বর্ণযুগ বলা চলে। এই অধ্যাত্মকেন্দ্রিক মহান শিল্পকর্ম গড়ে ওঠে খ্রিস্টীয় অষ্টম-নবম শতকের মধ্যে, কারও কারও মতে সপ্তম শতকও হতে পারে। পাথরের গায়ে নিখুঁত, নিপুণ অলংকরণ—পশুপাখি, লতাপাতা, জাতক-কাহিনি। তিলেক জায়গা খালি নেই। কেবল বিশালত্ব দেখেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যেতে হয় বোরোবুদুরের সামনে! এই বৌদ্ধ মন্দিরটি গড়ে উঠেছে স্তরে স্তরে।

সৈকত, বাটু বোলং

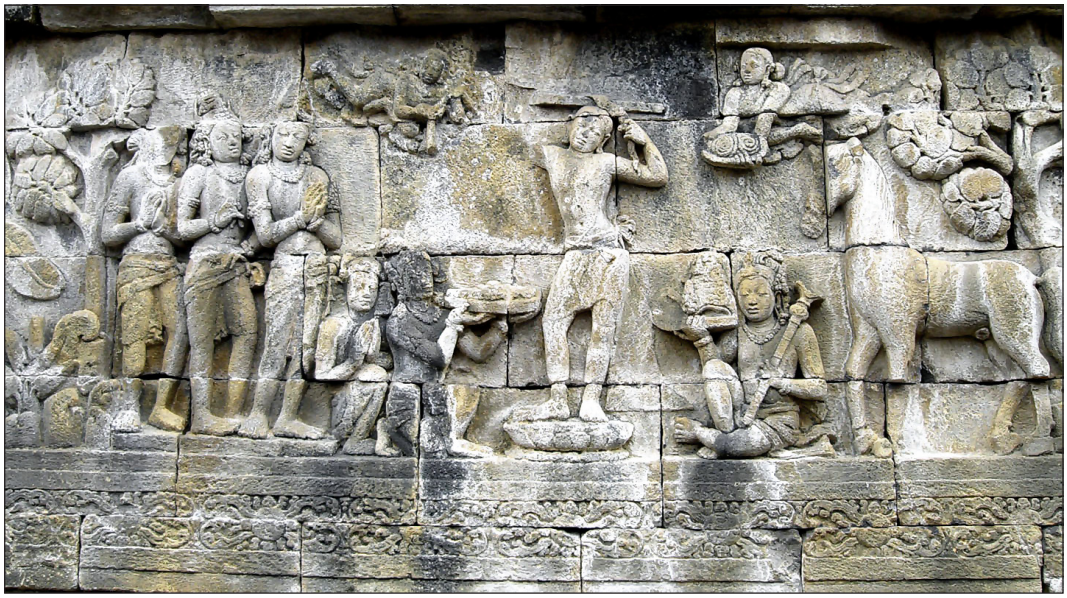

সিদ্ধার্থের সন্ন্যাসগ্রহণ, বোরোবুদুর

বুদ্ধমূর্তি, বোরোবুদুর

এই স্তরগুলি মানবজীবনের ও মনোজগতের ক্রমবিকাশের প্রতীক। রাজপৃষ্ঠপোষকতায় সুদক্ষ শিল্পী-কারিগররা পাথর কুঁদে ফুটিয়ে তুলেছেন গভীর ও গূঢ় দর্শন। পাথরের এ-ভাষা মন দিয়ে দেখতে গেলে বহু সময় লাগে। এমন অসাধারণ শিল্পসৃষ্টি এক সময়ে মেরাপি আগ্নেয়গিরির উদ্‌গীরণে ঢেকে যায়, জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যায়। উনিশ শতকে জঙ্গল পরিষ্কার করান টমাস স্ট্যামফোর্ড র‍্যাফল্‌স্‌।

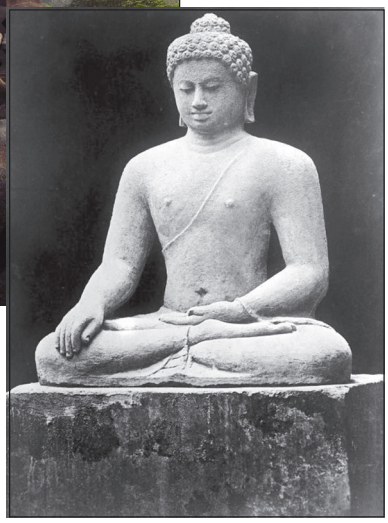

আগেই বলেছি এদেশে সর্বত্রই প্রবেশমূল্য খুব বেশি। সূর্যোদয়ে বোরোবুদুর দেখার টিকিট আরও চড়া। আমরা মাথাপ্রতি $40 দিয়ে বৌদ্ধ বোরোবুদুর ও হিন্দু মন্দির প্রামবানান (Prambanan)

প্রামবানানের মন্দিরগুচ্ছ

দেখার টিকিট একইসঙ্গে কেটে নিলাম। প্রামবানানের হিন্দু মন্দিরগুচ্ছ আনুমানিক নবম শতকে শৈব সঞ্জয় রাজবংশের রাজত্বকালে নির্মিত। মন্দিরগুলিতে দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্যশৈলীর সঙ্গে ইন্দোনেশীয় নির্মাণশৈলীর অপূর্ব মেলবন্ধন হয়েছে। প্রধানতম মন্দিরটি শিবের, তার একপাশে ব্রহ্মা ও অপর পাশে বিষ্ণুর মন্দির। এই তিন মন্দিরের উলটোদিকে তাঁদের বাহনদের অর্থাৎ নন্দী, হংস ও গরুড়ের মূর্তিসহ অপেক্ষাকৃত ছোট তিনটি মন্দির। পর্যটকরা এই প্রধান মন্দিরগুলিই সচরাচর দেখেন বটে, তবে আরও অনেক হিন্দু মন্দির আশপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মন্দিরগুলির ফাঁকে ফাঁকে অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভা মন্দিরশিখরে ছড়িয়ে পড়ে এক মায়াময় পরিবেশ রচনা করে তুলল।

শুনলাম বোর্নিও দ্বীপের যে-অংশ ইন্দোনেশিয়াভুক্ত সেখানে এবং সুমাত্রা দ্বীপে ওরাংওটাং দেখা যায়। আর আছে কোমোডো দ্বীপে প্রায় তিন মিটার পর্যন্ত লম্বা 'কোমোডো ড্রাগন' প্রজাতির সরীসৃপ। পৃথিবীতে একমাত্র ওখানেই দেখা যায় এই বিপন্ন প্রজাতির প্রাণীটিকে।

ইন্দোনেশিয়ার ভারতীয়দের 'Visa on arrival' বলে পর্যটকের ঢল বারো মাস লেগেই থাকে। এখানে খুব একটা ঋতু পরিবর্তনের বালাই নেই। আর এই দ্বীপপুঞ্জের রাষ্ট্রে অনবরত ভয়ংকর প্রাকৃতিক দুর্যোগ লেগেই আছে।

আজ ইন্টারনেট গোটা পৃথিবীকে নাগালের মধ্যে এনে দিয়েছে। ওয়েবসাইট দেখে যে-কোনও পছন্দসই প্যাকেজ নিয়ে অনলাইন বুকিং করে নেওয়া যায়। নানা মানের হোটেল ও

লোকপাল মূর্তি, প্রামবানান

রিসর্টের ছড়াছড়ি। থাই এয়ারওয়েজ, সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন, কুয়ালালামপুর কেন্দ্রিক এয়ার এশিয়া—সব উড়ানই যায়। তবে শেষেরটি সবচেয়ে অল্পমূল্যের।

কী মন্দিরে পুজোয়, কী ভারতীয় যোগব্যায়াম চর্চায়, কী দুই মহাকাব্যভিত্তিক নৃত্যনাট্যে—প্রাচীন ভারতের সঙ্গে আজও যেন মজবুত গাঁটছড়া বাঁধা আছে ইন্দোনেশিয়ার বালি, জাভা দ্বীপগুলির। ভারতাত্মাকে খুঁজে পাওয়া যায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই দ্বীপগুলিতে এলে।